১২

তৃতীয় বিশ্ব, উপনিবেশবাদ, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা

[Third World, Colonialism, South-South Cooperation]

১২.১ তৃতীয় বিশ্ব বলতে কী বোঝায়?

What is meant by Third World ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেসব নতুন ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মধ্যে 'তৃতীয় বিশ্ব' (Third World)-এর ধারণা অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ৬০-এর দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের ধারণা অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

সংজ্ঞা (Definition) : 'তৃতীয় বিশ্ব' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। **ফ্রানজ ফ্যানন** (Frantz Fanon) নামক এক আলজিরিয়ান লেখক প্রথম 'তৃতীয় বিশ্ব' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, তৃতীয় বিশ্ব বলতে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাইরে অবস্থিত স্বাধীনতার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় অবস্থিত প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে বোঝায়। **মিলার** (J. D. B. Miller)-এর মতে, কমিউনিস্ট নয়, আবার পুঁজিবাদীও নয় এমন সব দেশকে তৃতীয় বিশ্ব বলে ("The Third World is a cant phrase.....used to describe those countries which are plainly neither Communist nor Western.")। মিলার অবশ্য লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের বাইরে রেখেছেন। কারণ তাঁর মতে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির অনেক বৈসাদৃশ্য আছে।

অনেক সময় তৃতীয় বিশ্ব বলতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে বোঝানো হয়। কিন্তু বাস্তবে তৃতীয় বিশ্ব এবং জোটনিরপেক্ষ সমার্থক নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশই জোটনিরপেক্ষ হলেও, কিছু দেশ জোট-নিরপেক্ষ নয়। উদাহরস্বরূপ পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, জর্ডন প্রভৃতি দেশগুলি সেন্টো (Cento) নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত। আবার স্পেন, পোর্তুগাল, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু এদের তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই কারণে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন তৃতীয় বিশ্বকে রাজনৈতিক দিক থেকে না দেখে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা অধিক যুক্তিসংগত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সেইসব সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশ, অর্থনীতির বিচারে যারা ছিল অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল। তবে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও উন্নয়নের মাত্রার ক্ষেত্রে এইসব দেশের মধ্যে লক্ষণীয় তারতম্য দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্য, ভারতসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশের আর্থিক উন্নয়নের হার অন্যদের থেকে অনেক বেশি ও ক্রমবর্ধমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বের আর কোনো তাৎপর্যই রইল না। এই অবস্থায় 'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দটির পরিবর্তে 'উন্নয়নশীল বিশ্ব' শব্দটি ব্যবহার করাই সমীচীন বলে কেউ কেউ মনে করেন। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে 'দক্ষিণ' (South) নামে অভিহিত করার একটি রেওয়াজ শুরু হয়েছে।

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : রাজনৈতিক মতাদর্শ, রাজনৈতিক কাঠামো প্রভৃতির দিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে গরমিল থাকলেও উক্ত দেশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্যগুলি লক্ষ করা যায়। যথা—

(১) তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব দেশই এক সময় পরাধীন ছিল এবং জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং স্বাধীনতা লাভ করেছে।

(২) তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তিজোটের মধ্যে না গিয়ে জোটনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে।

(৩) বেশিরভাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশই নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত ; বৈদেশিক ঋণের দায়ে তারা আকণ্ঠ ডুবে আছে।

(৪) অধিকাংশ দেশই দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যার আধিক্য প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

(৫) এইসব দেশ সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি একান্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

(৬) অধিকাংশ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাই কৃষিভিত্তিক। কৃষিতে এখনও এইসব দেশে আধুনিক কৃৎকৌশলের প্রয়োগ ঘটেনি।

(৭) শিক্ষার অভাব, সামাজিক সচলতার অভাব, ব্যাপক শিল্পায়নের অভাব, জীবনযাত্রার নিম্নমান, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি হল তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

১২.২ তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা
Problems of the Third World

উৎপত্তির দিন থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত। নিম্নে সেইসব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সামাজিক সমস্যা : দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠু সমাজ সংগঠিত হতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে উপনিবেশগুলিতে **ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ** সৃষ্টি করেছে, জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে উপনিবেশের জনগণকে বিভক্ত করেছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থী আন্দোলন, লেবাননে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বিরোধ, সাইপ্রাসে গ্রিক ও তুর্কিদের বিরোধ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শাসনেরই উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে **শিক্ষার হার অত্যন্ত কম**। ঔপনিবেশিক শাসনে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসক নিজেদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় শহরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল না।

তৃতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি**। আর এই মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা অন্য বহু সমস্যা তৈরি করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, অপুষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে; আবার খাদ্যাভাব বা বেকারত্বের ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা, যেমন আইন-শৃঙ্খলার অভাব, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, চুরি, ছিনতাই, নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়তা, শিশু ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস কর্মসূচিগুলি সফল হয় না।

রাজনৈতিক সমস্যা : দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার জন্য তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই **উন্নত রাজনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি**। রাজনৈতিক পরিকাঠামো বলতে সেইসব অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলি সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, যেমন অবাধ নির্বাচন, সংসদীয় ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা অর্জন, শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল বিরোধী দলের অস্তিত্ব ইত্যাদি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই হয় একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন অথবা সামরিক শাসন অথবা বিদেশি মদতপুষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত জনবিরোধী শাসন দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসাধারণ জাতি, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি দিক থেকে বিভক্ত ছিল। বলা বাহুল্য বিদেশি শাসকগণ চেষ্টা করেছে এই

Scanned with CamScanner

ধরনের বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য বিভেদপন্থী শক্তিকে মদত দিয়েছে। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর, নামিবিয়া, আফগানিস্তান, লেবানন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

তৃতীয়ত, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে **রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তাঁদের নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই শ্রেণির হাতেই দেশের শাসনভার অর্পিত হয়।** স্বাভাবিকভাবে এইসব দেশে ব্যাপক মতৈক্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি এইসব দেশে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল **আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি,** যা সরকারকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বেড়েছে জনসাধারণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রাজনৈতিক চেতনার অভাব, সংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব, যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণে।

পঞ্চমত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুব উন্নত মানের নয়। দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবে এইসব দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠেনি ; ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ইচ্ছাও জনগণের মধ্যে তীব্র নয়।

অর্থনৈতিক সমস্যা : তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল **অর্থনৈতিক সমস্যা।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ দ্রুত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বন্ধন থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও ওইসব দেশে শিল্প, খনি ও কৃষিতে বিদেশি পুঁজির প্রভাব অব্যাহত থাকে। উন্নত দেশগুলি কখনোই চায় না উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটাক। বরং তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কাঁচামালের জোগানদার হিসেবে এবং নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার হিসেবে রাখতে চেয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশই এক শ্রেণিভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত। অন্যদিকে বাংলাদেশ, মায়ানমার, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, নিউগিনি প্রভৃতি দেশ কৃষিনির্ভর। ফিলিপিনস, দক্ষিণ-কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ পুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে, কিউবা, ভিয়েতনাম, উত্তর-কোরিয়া প্রভৃতি দেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে। ভারতের মতো কিছু দেশ আবার মিশ্র অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, সদ্যস্বাধীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি হাজারো সমস্যা ঘাড়ে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হল স্থিতিশীল সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এদুটিরই যথেষ্ট অভাব।

চতুর্থত, কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দেখা যায়, হয় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে কৃষিকে অবহেলা করা হয়েছে, অথবা কৃষিকে বাঁচাতে গিয়ে আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা হয়নি। এ ছাড়া উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পায়ন প্রক্রিয়া নানা সমস্যা তৈরি করেছে।

পঞ্চমত, নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি স্থগিত রেখেও অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র আমদানি করতে হয়। অস্ত্র উৎপাদনকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অস্ত্র রপ্তানির অনুকূলে পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় এবং অস্ত্র আমদানি তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে পঙ্গু করেছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠত, আগেই বলা হয়েছে, সদ্যস্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দেশ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উন্নত দেশগুলির কাছে ঋণের জন্য হাত পাততে হয়েছে। উন্নত দেশগুলি চড়া সুদে ঋণপ্রদান করেছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এবং সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে বেশকিছু কঠিন শর্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করতে হয় ঋণের সুদ মেটাতে। ঋণের আসলটি অপরিশোধ্যই থেকে যায়। এইভাবে ক্রমশ তারা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে অনেক উন্নয়শীল দেশ চূড়ান্ত হতাশা, দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে।

উপসংহারে বলা হয়েছে, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার আগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে সম্বল করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর তাদের সকলেরই আশা বা স্বপ্ন সফল হয়নি। আর এই আশাভঙ্গের মূলে আছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সযত্নলালিত ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্বকামী মনোভাব, যা নয়া উপনিবেশবাদ হিসেবে কার্যকর রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমানে উপনিবেশবাদ যথারীতি বহাল আছে, শুধু এর বহিরঙ্গটি একটু বদলেছে।

১২.৩ বিশ্বরাজনীতির ওপর বিশেষ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর তৃতীয় বিশ্বের প্রভাব

The impact of third world on the world politics, specially on the UN

আধুনিককালের, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর প্রভাব। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনগুলিতে, কমনওয়েলথ-এর সম্মেলনগুলিতে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এবং এর বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্মে, বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের উপস্থিতি ও ভূমিকা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও কার্যধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তৃতীয় বিশ্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৬০-এর দশক থেকেই জাতিপুঞ্জে বহুসংখ্যক তৃতীয় বিশ্বভুক্ত সদস্য-দেশগুলির উপস্থিতির ফলে সাধারণ সভার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের মুহূর্তে এর সাধারণ সভার সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫১। কিন্তু ৬০-এর দশকে এই সংখ্যা ১৫০ অতিক্রম করে। জাতিপুঞ্জে তৃতীয় বিশ্বের উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকা জাতিপুঞ্জকে তার কর্মধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে। সাধারণসভার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আগের মতো আর নেই।

(২) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্রেও কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যেমন, নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৮ থেকে বাড়িয়ে ৫৪ করা হয়েছে।

(৩) UNCTAD, ILO, WHO, FAO প্রভৃতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্মে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিগণকে সমাসীন থাকতে দেখা যায়। এমনকি জাতিপুঞ্জের তৃতীয় ও পঞ্চম মহাসচিবের পদ অলংকৃত করেছেন তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী। তৃতীয় বিশ্বের সদস্যদের নিয়ে জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে যে 'Group of 77' গঠিত হয়েছিল, এখন এর সদস্য সংখ্যা শতাধিকে পৌঁছে গিয়েছে।

(৪) পূর্বে এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কাজ ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও জাতিপুঞ্জকে সমান গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। কারণ জাতিপুঞ্জ মনে করে, তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধান করতে না পারলে ভবিষ্যতে এগুলিকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

(৫) তৃতীয় বিশ্বভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ নীতি, জাতি-দাঙ্গা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। তারা অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রাসন ও আধিপত্যমূলক রাজনীতির বিরোধিতা করেছে।

(৬) তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই আন্তর্জাতিক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন একটি শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছে।

Scanned with CamScanner

(৭) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বে অধিকতর সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছে।

(৮) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, কৃৎকৌশলগত ও সাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। সার্ক, আসিয়ান, ওপেক, অ্যাপেক, জি-৭৭ প্রভৃতি সংস্থা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(৯) পরিশেষে বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে, নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর করার ক্ষেত্রে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, বিশ্বের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সক্রিয় উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তারা আণবিক যুদ্ধের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেছে।

তবে বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অনৈক্যের ফলে এবং তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার ফলে তৃতীয় বিশ্বের আন্দোলন বহুক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রক্তচক্ষুর সামনে গুটিয়ে থাকতে হয়।

Scanned with CamScanner